জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৫, সংখ্যা-১
জানুয়ারি-জুন ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.85310
Page: 13-25

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প: 'তস্য' মধ্যবিত্ত নারী

ড. সাবিনা ইয়াসমিন*

Abstract

In Bengali literature, Jibanananda Das (1999-1954) has cemented his legacy as a poet. However, the stories discovered after his death later brought him recognition as a storywriter as well. He wrote a total of 108 stories. The stories reflect existential crisis of middle class life. Women have no distinct history as part of the middle class. In the 1930s, when Jibanananda Das was engaged in story writing, the concept of women's professional life, wealth, and status had not yet been established in society. A woman's class position as a middle class individual is subordinate to that of a middle class man or his family. In Jibanananda Das's stories, women are portrayed as educated and self-aware. However, their professional lives held no significance in society. Although the nineteenth-century Bengal Renaissance emphasized women's education and social freedom but the question of their economic independence remained neglected. The women in His stories are confined to household responsibilities and child-rearing, reflecting the broader marginalization of women's labor. This confinement raises a crucial social inquiry: how should the class position of domestic women be understood? This research aims to analyze the socio-structural framework of middle class women in Jibanananda Das's stories. An analytical approach will be followed in the present research paper. Through this analysis, it is possible to gain a clear understanding of the rise and development of middle class women as social and cultural entities. This analysis also examines the intersection of gender, economy, and social structure in colonial Bengal.

মুখ্যশব্দ: উপনিবেশ, ভদ্রমহিলা, নবজাগরণ, পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ, নারী, মধ্যবিত্ত

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঔপনিবেশিক আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি মূলত ব্রিটিশ শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ ইতিহাসের নানা পর্বে নানা পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে ভূমিব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি মাইলফলক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পত্তনিস্বত্ব আইন প্রণয়ন বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে ভূমি-মালিকানাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের ক্ষেত্রে : '১৭৯৩ সনে ভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'সম্পত্তির যাদুস্পর্শে' (Magic touch of property) বাংলার সমাজে একটি 'ভদ্রলোক' শ্রেণি সৃষ্টি করা।'[১] মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী 'ভদ্রলোক' শব্দটি লিঙ্গনিরপেক্ষ নয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার বাবুদের নিয়ে *নববাবু বিলাস* (১৮২৫) লেখার পর তাদের বিবিদের নিয়ে পুনরায় *নববিবি বিলাস* (১৮৩০) শিরোনামে আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে সামাজিক ইতিহাসের ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। যৌক্তিকভাবে 'ভদ্রলোকে'র বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজে 'ভদ্রমহিলা'র অস্তিত্ব তৈরি হওয়ার কথা। এই 'ভদ্রমহিলা' কারা? মেরেডিথ বর্থউইক তাঁর *The Changing Role of Women in Bengal* গ্রন্থে বলেছেন: 'সাধারণ অর্থে ভদ্রলোক পরিবারের কন্যা, জায়া, জননীরা হলো ভদ্রমহিলা। ঔপনিবেশিক বাংলার অগণিত স্কুলমাস্টার, আইনজীবী, ডাক্তার, যারা ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সরকারি চাকুরে – এ ধরনের মধ্যবিত্তের সিংহভাগ পরিবারের নারীরাই এই ভদ্রমহিলা – যারা নিজের অধিকারবলে ভদ্রমহিলা, অর্থাৎ একটি নতুন সামাজিক ব্যক্তিত্ব।'[২] অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীন মধ্যবিত্ত পরিবারবৃত্তের মধ্যবিত্ত পুরুষের অধীন – 'তস্য' নারীকে বলা হচ্ছে ভদ্রমহিলা, মধ্যবিত্ত হিসেবে নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ইতিহাস নেই। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* গ্রন্থে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শিক্ষিত, সচেতন ও সক্রিয় নারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে: 'শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলা'।[৩] ঔপনিবেশিক আমলে প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যবিত্ত বলতে পুরুষ এবং হিন্দু বোঝাত। নারী এবং মুসলিমরা মধ্যবিত্ত হিসেবে বিকশিত হয়েছে বিলম্বে এবং নিশ্চিতভাবেই স্বতন্ত্র আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। 'ভদ্রলোক' তথা মধ্যবিত্ত বিকশিত হয়েছিল বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে, একইভাবে 'ভদ্রমহিলা' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও কিছু সুনির্দিষ্ট শর্তের কথা জানা যায়: 'এরা সাধারণভাবে ভদ্রলোক পরিবারের মহিলা সদস্য হলেও এ শব্দটি ব্যবহার করা হতো বিশেষ কিছু গুণাবলি এবং জীবনযাত্রার অধিকারিণী মহিলাদের ক্ষেত্রে।'[৪] ভদ্রলোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হলেও এইসব ভদ্রমহিলারা মধ্যবিত্ত শ্রেণিবর্গভুক্ত কিনা সেটা বড় প্রশ্ন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত পুরুষেরা কিছু সাধারণ ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল, যা মধ্যবিত্ত চেতনা গঠন করেছিল। অন্যদিকে নারী ভদ্রমহিলারা অন্যান্য মহিলার চেয়ে স্বতন্ত্র এবং বিশেষ কিছু ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থাকলেও তার শ্রেণিবর্গভুক্তির মাপকাঠি তার পরিবার অথবা পুরষ। নারী তার নিজস্ব শিক্ষা, পদমর্যাদা বা বিত্তের ভিত্তিতে মধ্যবর্গে স্থান পায়নি। অষ্টাদশ, উনিশ এমনকি বিশ শতকেও নারী 'পর্দানশীন', পুরুষ তার বয়ানকারী, নারীভাষার বাহক। বিশ শতকের তিরিশের দশকে লেখা জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে নারীর কণ্ঠ নেই, পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই নারীর সামাজিক ভূমিকা, ব্যক্তিত্ব ও মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সময় ও সমাজের নানা উপাদান কেবল ইতিহাসের পাতাতেই লিপিবদ্ধ থাকে না, সাহিত্যেও নিশ্চিতভাবে হয়ে উঠতে পারে সামাজিক ইতিহাসের বাহন, বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর অস্তিত্ব অনুসন্ধানে জীবনানন্দের গল্পগুলো হতে পারে নির্ভরযোগ্য উৎস। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ

দাশের প্রধান পরিচয় তিনি কবি, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটি ছিল তাঁর একমাত্র সাহিত্যিক পরিচিতি। এজন্য তাঁর নামের পূর্বে যুক্ত হতে দেখা যায় 'শুদ্ধতম কবি' অভীধাটি। মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পরে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের বিশাল জগৎ। এ কারণে বর্তমানে জীবনানন্দ দাশকে 'শুদ্ধতম কবি' হিসেবে মূল্যায়নের আর সুযোগ নেই। গল্পগুলোকে তিনি নিজে প্রকাশের জন্য পরিশোধন করে যেতে পারেননি, সেগুলো খসড়া আকারে লেখার খাতায় সঞ্চিত ছিল। সম্পাদকের পরিমার্জনা ও অভিরুচিতে যেসব গল্প প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে গল্পকার জীবনানন্দের পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' (১৮৯০) গল্পটিকে বাংলা ছোটগল্পের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করলে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দের মৃত্যুর কাল পর্যন্ত প্রায় ছয় দশকের ছোটগল্পের ইতিহাসে কোথাও তাঁর নাম নেই, কারণ তখনো তাঁর গল্পগুলো নিভৃতচারী, ফলে প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ছিলেন কেবল কবিতার আকাশের অক্ষয় জ্যোতি। বনলতা সেন তাঁকে যেভাবে অমর-অজর-অক্ষয় করে রেখেছে কবিতার প্রান্তরে, তেমন কোন যুগান্তকারী নারী তাঁর কবিতার পটে আর নেই। গল্পের পটে যেসব নারীকে পাওয়া যায় বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার অভাবে তাদের যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রটি উপেক্ষিত থেকে গেছে।

রোমান্টিক কবি হিসেবে জীবনানন্দ কবিতার ক্ষেত্রে নারীকে নিয়ে যেভাবে ভেবেছেন, তা অচরিতার্থতার ইতিবৃত্ত, শূন্যকল্প হৃদয়ে যে নারীর ছবি তিনি আঁকেন সে নির্বাণের মতোই আকাঙ্ক্ষিতা আবার সুদূরের – এমন ভাবা যেতে পারে জীবনানন্দের ওপর বৌদ্ধ জীবনদর্শনের প্রভাবের দিকে তাকিয়ে। কারণ বনলতা সেন জীবনের সব লেনদেন চুকে যাবার পর আবির্ভূত হন – আলোয় নয়, অন্ধকারে। সব লেনদেন চুকে যাবার পর আর যাই বাকি থাক, প্রেম বাকি থাকে না। বনলতা কোনো নারীসত্তা নয়, পরমসত্তা। কবিতার অচরিতার্থতা গল্পে এসে রূপান্তরিত হয়েছে অতৃপ্তি ও অস্থিরতায়। জীবনানন্দের গল্পের নায়কদের এসব অতৃপ্তি ও অস্থিরতা কেবল প্রেম ও রোমান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ নয়, এর সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ ভারতের কয়েক শতাব্দীর আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। জীবনানন্দের অধিকাংশ নায়ক শহরমুখী মধ্যবিত্ত, ফলে নতুন প্রতিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের একটা লড়াই তাদের ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়েছিল ভূমি মালিকানা, চাকুরি এবং ব্যবসায়সূত্রে। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত ভূমিকেন্দ্রিক ছিল, পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে গ্রাম ও মফস্বল থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা শহরে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। বিশ শতকের কলকাতা এসব স্থানান্তরিত মধ্যবিত্তের জীবিকা সংস্থানের জন্য সহজ ক্ষেত্র ছিল না, জীবনানন্দ দাশের নায়কদের জীবন ও জীবিকার লড়াই সেই বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে:

> 'সমগ্র উনিশ শতক ছিল বর্ধিষ্ণু কলকাতা ও মধ্যবিত্তের স্বর্ণযুগ, কিন্তু বিশ শতকের শুরুতেই তাদের স্থানান্তরের সন্ধিক্ষণ ও বিসর্পিল অন্ধকারযাত্রা – সর্বপ্রসারী মূল্যবিনষ্টির মানবিক অপচয়, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বেকারত্ব ও অনির্দিষ্ট গতিই মূলত সমকালীন মধ্যবিত্তের সামাজিক বাস্তবতা।'[৫]

জীবনানন্দের মধ্যবিত্ত নায়কদের অধীন তাদের ঘরের নারীরা। নারীর সরাসরি কোনো বয়ান না থাকায় এই নায়কদের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেই বিশ শতকের মধ্যবিত্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়। জীবনানন্দের গল্পে শিক্ষিত, আধুনিকমনস্ক, ব্যক্তিসচেতন, পেশাজীবী, শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নারীরা রয়েছে। 'বেশি বয়সের ভালোবাসা', 'পূর্ণিমা', 'বিলাস', 'মেয়েমানুষের রক্তমাংস', 'বাঘিনীর মতো' 'আস্বাদের জন্ম' – এই গল্পগুলোতে শিক্ষিত, সচেতন ও পেশাজীবী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-পরবর্তী সাহিত্যভাণ্ডারে কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সঙ্গে একটি বড় গল্পও ছিল: 'জীবনানন্দের গদ্য-পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে পুরনো রচনাগুলির অন্যতম এই 'পূর্ণিমা'।'[৬] নামচরিত্র নারী হলেও কাহিনির বয়ান সম্পন্ন হয়েছে সন্তোষের দৃষ্টিকোণ থেকে। চামেলি বিধবাশ্রমের স্কুলে শিক্ষক ছিল, পিকেটিংয়ের দায়ে তাকে চাকরি ছাড়তে হয়। নতজানু হলে চাকরিটা বাঁচানো যেত জানা সত্ত্বেও চামেলির প্রবল ব্যক্তিত্ব নতি স্বীকার করেনি। 'বেশি বয়সের ভালোবাসা' গল্পের আভা শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরে চাকরিটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করে। 'মেয়েমানুষের রক্তমাংসে'র লীলা শিক্ষিত, বাংলা মাসিক পত্রিকা পড়ে, মার্জিত রুচির শাড়ি পরে, গৃহশ্রী বজায় রাখার ব্যাপারেও সচেতন। 'বিলাস' গল্পের সুস্মিতা এবং 'বাঘিনীর মতো' গল্পের শম্পাকে দেখা যায় কর্পোরেট অফিসে নারীর জন্য চ্যালেঞ্জিং চাকরিতে যুক্ত হতে। 'আস্বাদের জন্য' গল্পে নীহার স্বচ্ছলতার অভাবে বি.এ পড়তে পারে না, চাকরির জন্য বাড়ি ছেড়ে এমনকি আফ্রিকায় যেতেও সে প্রস্তুত। এসব নারী কেবল শিক্ষিতই নয়, সময়সচেতন এবং আত্মসচেতন।

নারী সময় ও আত্মসচেতন হলেও তাদের পেশাগত জীবনের কোনো সামাজিক গুরুত্ব নেই, ফলে তারা নিজেরাও নিজের পেশাগত জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শেখেনি। উনিশ শতকের নবজাগরণের যে প্রবল উদ্দীপনা সেই শক্তির একটা বড় অংশ ব্যয় করা হয়েছে নারীভাবনায়, বিশেষ করে সমাজসংস্কারের বেশিরভাগই সম্পন্ন হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করে। নারীশিক্ষার বিস্তার এ সংস্কার প্রকল্পে প্রাধান্য পেয়েছিল। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য নিয়ে নানা মত তৈরি হতে থাকে। এ মতামতগুলো প্রায় সর্বাংশে পুরুষ সংস্কারবাদীদের চেতনা থেকে উৎসারিত। এর একদিকে ছিল ঐতিহ্যসচেতনতা, অন্যদিকে ইউরোপীয় আদর্শ। নারীশিক্ষা বিষয়ক নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন কাঙাল হরিনাথ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সেসময়ের কিছু গোষ্ঠী ও পত্র-পত্রিকা, যেমন ইয়ং বেঙ্গল, *জ্ঞানান্বেষণ*, *তত্ত্ববোধিনী*। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বৈবাহিক উপযোগিতা সৃষ্টির জন্যই নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কর্মমুখী শিক্ষা নারীর প্রয়োজন নেই বলে মত প্রকাশ করেছিল *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা। এ পত্রিকা প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে এভাবে: 'অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি।'[৭] কাঙাল হরিনাথ নারীদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে অর্থ উপার্জনের আশা করেননি, শিক্ষার মাধ্যমে নারীর জ্ঞানধর্মের বিকাশ চেয়েছিলেন। নারীর ধর্ম যে পাতিব্রত্য সে কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র নারীর প্রথম ধর্ম হিসেবে দেখেছিলেন পাতিব্রত্যকে। রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষার ব্যাপারে উদার, তিনিও শিক্ষার মাধ্যমে নারী অর্থ-বিত্ত অর্জন করবে এমনটি ভাবেননি, ফলে তিনি নারীর জন্য 'পরীক্ষামুখী' শিক্ষার পরিবর্তে 'প্রবণতামুখী' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নারীশিক্ষার উপযোগিতার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছেন তাঁর 'ল্যাবরেটরি' গল্পে: 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনাকুটনি, এটা মানবশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি।'[৮] এরকম উদ্দেশ্য ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর নারীশিক্ষাভাবনাতেও দেখা যায়: 'মেয়েদের শিক্ষা তারা নিছক করুণাবশত চায়নি; নিষ্কাম কর্তব্যেও নয়, তারা চেয়েছিল, মেয়েরা পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গী হবে।'[৯] নারী শিক্ষার ব্যাপারে যুগোপযোগী চিন্তা করেছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। মধ্যবিত্ত নারী বুদ্ধিজীবী হিসেবে

নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা, তা থেকে উত্তরণ এবং নারীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও কর্ম অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ:

> 'তিনি এমন শিক্ষার কথা বলেছেন (বলছেন) না যা নারীকে পুরুষ করে তুলবে; বরঞ্চ সেই শিক্ষা নারীকে করে তুলবে পূর্ণ মানুষ, উপনিবেশের খণ্ডিত দাস নয়। আর পূর্ণ মানুষ হচ্ছেন তিনি যিনি কেবল "আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা" নন; তিনি একজন স্বাধীন চিন্তাক্ষম আদর্শ নাগরিক।'[১০]

নারীর আধুনিকায়ন ও শিক্ষা বিষয়ে দুটি সুস্পষ্ট প্রবণতা তৈরি হয় উনিশ ও বিশ শতকে। একটি পক্ষ নারীকে দেখতে চেয়েছিলেন পুরোনো ঐতিহ্যের নবায়নের ভেতর দিয়ে কল্যাণীরূপে, আরেক পক্ষ ইউরোপীয় আদর্শে নারীকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কোনো পক্ষই স্বনির্ভরতা বা অর্থ-উপার্জনের সঙ্গে নারীশিক্ষাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখেননি। ফলে, মধ্যবিত্ত একটি অর্থনৈতিক কাঠামোভিত্তিক বর্গ হলেও নারী অর্থ ও বিত্ত থেকে বিযুক্ত থাকায় পিতা, স্বামী অথবা পারিবারিক অবস্থানের ভিত্তিতে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে অধিভুক্ত হতে হয়েছে। জীবনানন্দ যেসব নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন মধ্যবিত্ত হিসেবে তাদের চেতনাগত বিকাশ কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার বিচারের ভার তুলে দিয়েছেন পুরুষ চরিত্রের হাতে। পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রাচীন মূল্যবোধ ও নতুন ইউরোপীয় সংস্কৃতির যে বিরোধ সেটি পূর্ণ মাত্রায় কাজ করেছে। একদিকে তারা যেমন কর্মদক্ষ, সংসার সুনিপুণ কল্যাণী গৃহবধূ চান আবার একইভাবে চান শিল্পবোধসম্পন্ন মানসসঙ্গিনী। 'হাতের তাস' গল্পের নায়ক প্রমথ। ওকালতি ও শিক্ষকতার ব্যর্থ অভিজ্ঞতা রয়েছে, শেষ পর্যন্ত বাবার কেরাণির চাকরি পাওয়ার জন্য নানা তদবির করে বিফল হয়ে বেকার জীবনযাপন করে। তার একটাই সান্ত্বনা 'আর্টিস্টরা যতই নিষ্ফল হোক না কেন, সম্রাটের চেয়েও পরিতৃপ্ত তারা।'[১১] এই পরিতৃপ্তির ভেতরে অতৃপ্তি হিসেবে কাজ করে প্রমথের দাম্পত্যজীবন। প্রমথকে তার স্ত্রী সুমিত্রা অর্থনৈতিক মানদণ্ডেই বিচার করেছে: 'নিজের জীবনকে প্রমথের স্ত্রী অত্যন্ত অসাড় মনে করে। একটা বেকার উকিলের বউ, একটা উচ্ছন্নে যাওয়া কেরানির একটা দজ্জাল শাশুড়ির পুত্রবধূ – নিজের জীবনটাকে সুমিত্রা একটা পোড়ো ভিটের মরা ধুধুলে লতার মতো পণ্ড মনে করে।'[১২] প্রমথের দাম্পত্য হাহাকার ও প্রত্যাশা মূর্ত হয়ে ওঠে কয়েকটি চিঠিকে কেন্দ্র করে, যে চিঠিগুলোতে ছিল তার অতীতের সম্ভাব্য বধূদের খবর। তার মনে হয়: 'বধূ যেন এই কয়টি, এই চিঠির ভিতরকার শ্যামস্নিগ্ধ, রূপলাবণ্যসম্পন্না, পতিপরায়ণা, মমতাকোমল এই মেয়ে কটি।'[১৩] তার রোমান্টিক কল্পনার জগতে এসব কল্যাণী নারী 'নাগেশ্বর চাঁপা', অন্যদিকে কঠোর বাস্তববোধসম্পন্ন সুমিত্রা তার কাছে 'কাঁটাঝোপে'র মতো।

শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী নারী, যারা কোনো পেশার সঙ্গে যুক্ত নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারবৃত্তে তার ভূমিকা কী ছিল? 'বাসনাকামনার গন্ধ' গল্পের কনককে দেড় বছরের শিশু-সন্তানের কারণে পড়াশোনা ছাড়তে হয়, এ ব্যাপারে অবশ্য সে পারিবারিক সমর্থনও পায়নি: 'তারপর আমরা কনককে কেউ উৎসাহ দেই না। ইংরেজি বাংলা সে বেশ লিখতে পড়তে পারে। শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তার এইটুকু উপার্জনই আমরা যথেষ্ট মনে করি।'[১৪] একজন গৃহী নারীর কাছে পরিবারের প্রত্যাশার ধরন সম্পর্কে গল্পের নায়ক জানাচ্ছে:

> আমরা চাই, সে খুব সকালে ঘুমের থেকে উঠে উনুন জ্বালিয়ে ভাত চড়াক। বাজারের হিশাব ঠিক করুক, আমাদের চা দিক, বাসন মেজে, মশলা বেটে মাছ তরকারি কুটে দস্তুরমতো রান্না শুরু করে দিক। সকলকে পরিবেশন করুক। কাপড় জামা সকলের কেচে শুকোতে দিয়ে না হয় দুটো পান মুখে দিয়ে হলুদ

> মরিচ মাখা শাড়িখানা নিয়ে ছেলে কোলে পাড়ার সমবয়সী বধূদের সঙ্গে দু-দণ্ড গল্পগুজব করে আসুক। তারপর বেলা পড়বার মুখে খিড়কির পুকুরে কয়েকটা ডুব দিয়ে খেয়েদেয়ে আবার বিকেলের জন্য, রাতের জন্য তৈরি হোক।[১৫]

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন – কনক শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী এবং নিঃসন্দেহে ভদ্রমহিলা, স্বামীর জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা বিষয়ে সচেতন, মধ্যবিত্তের রোমান্টিক আদর্শ ও কল্পনাকে সে প্রশ্নবিদ্ধ করে। প্রচলিত সংসারধর্মে তার ভূমিকা নায়কের মনে তীব্র আক্ষেপের জন্ম দেয় এবং সাধারণ গৃহী নারীদের কর্মক্ষমতার তুলনায় শিক্ষিত কনকের ব্যর্থতা বড় হয়ে ওঠে: 'কিন্তু এখন যখন দেখছি কনক বই আর ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কোনো কাজেই এল না, এখন মনে হয় – 'বাঃ পাড়াগাঁর সাধারণ গৃহস্থ বধূদের সুস্থতা, কর্মদক্ষতা – এইসব আমি ভাবি।'[১৬] এই প্রত্যাশারই আরো আবেগঘন বিস্তৃত রূপ পাওয়া যায় 'কিন্নরলোক' গল্পে। গল্পটি একান্নবর্তী পরিবারের পটভূমিতে নির্মিত। স্ত্রী সরযূ 'সুস্থ', 'সুন্দরী', 'বুদ্ধিমতী' ও 'শিক্ষিতা'। ব্যবহারিক জীবনের যেসব 'খুঁটিনাটি'কে দাম্পত্য প্রেমের মাপকাঠি হিসেবে এ গল্পে ধরা হচ্ছে, সেগুলো হলো – গরম গরম খাবার পরিবেশন, ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বামীর আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা করা। নায়ক সুবোধ সান্ধ্যকালীন হাওয়া খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার খবরে নিগৃহীত বোধ করে। সাংসারিক দায়িত্বে অবহেলার জন্য স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার বিষয়টি সুবোধের কাছে অন্যায় বলে মনে হয় না:

> সমস্ত অভিমান ও ক্রোধ সরযূর ওপরেই গিয়ে পড়ে শুধু। পিসিমা কাকিমারা থাকলে ব্যাপারটা যে কিছুতেই এরকম হত না নিজের হাতেই তাদের কেউ না কেউ পরিবেশন করত যে ভাত ডাল গরম গরম পাওয়া যেত, এই ভেবে মনের ভিতর এমন লজ্জা, এত ক্ষোভ জমে ওঠে। কেন এমন যে পিসিমারা থাকলে তাঁরা প্রতীক্ষা করে থাকবেন সুবোধকে–কতক্ষণে আসবে তারই ধুয়ো ধরে থেকে সে এলে নিজেদের হাতে গরম জিনিশ পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে তবে তারা হাতছাড়া হবেন, আর বধূকে দিয়ে সে সব কিছু হবে না? এ কেমন?[১৭]

শিক্ষিত নারীকে নিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কবিতায় যে ভীতিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারই বাস্তবরূপ এ গল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবনানন্দের অধিকাংশ গল্পকে সমালোচকেরা আত্মজৈবনিক বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে, সংসার-দ্রোহী এসব নারীর ভেতরে অনেকে কবি-পত্নী লাবণ্য দাশের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। কুসুমকুমারী কবি হলেও সাংসারিক দায়-দায়িত্ব প্রতিপালনে একনিষ্ঠ ছিলেন, সে স্বীকৃতি জীবনানন্দ নিজ মুখে অনেক জায়গায় জানিয়েছেন। গল্পের মধ্যেও সেই কল্যাণী মাতৃপ্রতিমার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়:

> কতদিন মায়ের ওপর রাগ করে রাতের বেলা, এমনকী কটকটে দুপুরেও বিছানা নিয়ে বসত সুবোধ। কিছুতেই ভাত খাবে না সে। কিন্তু তার প্রতিটি দিনের ধনুর্ভাঙা পণ মা বিছানায় বিছানায় পথেঘাটে ঘরের কোণে গাছতলায় এ পৃথিবীর অত্যন্ত অগোচর অন্ধতম জায়গায়ও সুবোধকে অনুসরণ করে করে ভেঙে ফেলেছে।[১৮]

'বত্রিশ বছর পরে' গল্পে দেখা যায় স্বর্ণ মা হিসেবে ব্যর্থ: '...স্বর্ণ খুকুনকে প্রসব করেছে শুধু আর বিশেষ কিছু করেনি।'[১৯] আধুনিক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী নারীর সঙ্গে প্রবীণ কল্যাণী নারীদের তুলনার একটা ক্ষেত্র জীবনানন্দ উন্মুক্ত রাখেন:

> জীবনানন্দের মাতৃ-প্রত্নস্মৃতি কুসুমকুমারীর সান্নিধ্যে যতটা সুস্থ ও সবল সাবলীলতায় বিকশিত হয়েছে, প্রজন্ম-ব্যবধান ও ব্যক্তি-ভিন্নতায় লাবণ্য দাশের পক্ষে তা পরিপূরণ অসম্ভব হতেই পারে। ফলে সনাতন মহত্ত্ব ও ত্যাগী মানসিকতার বিপরীতে চাহিদার অত্যুচ্চ আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছেন জীবনানন্দ।[২০]

কেবল 'প্রজন্ম-ব্যবধান' ও 'ব্যক্তি-ভিন্নতা'ই নয়, উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে মধ্যবিত্ত পরিবারবৃত্তের নারীর মানস-পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপাদান। পুরোনো মূল্যবোধের প্রভাবে জীবনানন্দ দাম্পত্য প্রেমের ভেতরে নারীর যে কল্যাণী মূর্তি সন্ধান করেছেন বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে তার সাক্ষাৎ লাভ করা সুকঠিন ব্যাপার। তারপরও অনেক গল্পে এ আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে: 'জীবনানন্দ তাঁর সমকালীন জীবনের নৈরাশ্যমুক্তি, আশ্রয় ও শুশ্রূষার প্রাণস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দাম্পত্যে সমর্পিত ও উজ্জীবিত হতে চেয়েছেন। তাঁর আশৈশবলালিত নারীর কল্যাণীমূর্তি এক্ষেত্রে প্রেরণাশক্তি।'[২১] কিন্তু শুধু 'কল্যাণীমূর্তি' অনুসন্ধান জীবনানন্দের গল্পে নারীর কাছে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নয়, প্রত্যাশার আরও অনেক ধরন রয়েছে যেখানে 'কল্যাণীমূর্তি'র ধারণাটি অকেজো হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যখন তিনি শিল্পবোধসম্পন্ন উপযুক্ত মানসসঙ্গিনী সন্ধান করেন। কিন্তু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও উপায়ে শিক্ষা-দীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় নারীরা বেশিরভাগ সময় পুরুষের শিল্পবোধের উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে নতুন আকাঙ্ক্ষার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় জীবনানন্দের নায়কেরা। 'মেয়েমানুষের রক্তমাংস' গল্পে স্বামী অজিত ভাবছে:

> দু-চারখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা লীলা রাখে। সে সবের গল্পই সে পড়ে। ...যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত বধূর মতো সহজবোধ জিনিশ নিয়ে সে খুশি, গহনা চায়, অবিশ্যি একটা মার্জিত রুচির শাড়ি ভালবাসে, খুব বেশি দামের নয়, সাধারণ গৃহশ্রী জিনিশটাকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। লীলাকে নিয়ে সত্যিই বেশ চলত – বাঙালি প্রায় যে কোনো স্বামীর। কিন্তু অজিতের কাছে এ মেয়েটি শাদা সেদ্ধ শালগমের মতো মনে হচ্ছে, না আছে নুন না আছে কাসুন্দি।[২২]

লীলাকে নিয়ে অজিতের কেন চলছে না সে সম্পর্কে জানা যায়: 'বধূকে সে ফরাসি উপন্যাসের অনুবাদ করে শোনাবে লিখেছিল, ফরাসি রিয়ালিজম ও অশ্লীলতার চূড়ান্তে তাকে ভর্তি করে নেবে ভেবেছিল। যে লীলা বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়া আর কিছু বুঝেই উঠতে পারল না, জীবনটা কী একটা অদ্ভুত ঠাট্টা।'[২৩] জীবনানন্দের *Literary Notes* থেকে জানা যায়, তিনি এমন নারীকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে নারী হবে 'something materially poor but spiritualy rich'[২৪] গল্পের নায়কদের মনোজগতে অধরা মাধুরী, বিপুল সৌন্দর্য, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ে যে নারী উপস্থিত হয়, বাস্তব জীবন ও জগতে সেরকম নারী অস্তিত্বহীন, অন্তত তিরিশি সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে। জীবনানন্দের গল্পে তাঁর কাঙ্ক্ষিত মানসীপ্রতিমা দুএকজন নারীকে পাওয়া যায়, যারা পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে দেখা দিয়েছে, বাদবাকি যাদের খুঁজে পেয়েছেন তারা শিল্পবোধসম্পন্ন তো নয়ই, বরং শিল্পচর্চার পথে অন্তরায়। জীবনে এবং সাহিত্যে প্রেরণা হিসেবে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য, বিশেষ করে কবিতা ও নারী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা দিয়েছে: 'কবিতা নারীর মতো, পৃথিবীর সবুজ ঘাসের মতো, সকলের সমক্ষে উপস্থিত থাকা তার দরকার।'[২৫] কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে নারীর ভূমিকা কবিতার অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। স্ত্রী প্রসঙ্গে জীবনানন্দ তাঁর *Literary Notes*-এ জানাচ্ছেন: 'wife : the bleak future..No way wriggling out'[২৬] সিদ্ধেশ্বরবাবু নামক বিখ্যাত এক কবির জবানিতে তার শিল্পীজীবনের গভীর সাধনার ভেতরে তার স্ত্রীর মানসিক অবস্থান, দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়ার হিসেবটি দ্বন্দ্বজটিল। সিদ্ধেশ্বরবাবুর দাবি তিনি যদি 'সাধারণ' মানুষ হতেন, অর্থাৎ কবি না হতেন তাহলে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি জীবনটাকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে পারতেন। কিন্তু কাব্যচর্চার জগতে তার স্ত্রী সাক্ষাৎ উপদ্রবের মতো:

> [...] স্ত্রী টাকা চায়, কলকাতা চায়, সন্তান চায় না। কখনো কড়ি খেলে তাকে ভুলিয়ে রাখতে হয়েছে। ...এরকম স্ত্রী নিয়েই সংসারে মানুষ সুখী হয়। প্রায় ঘরেই এইরকম মেয়েমানুষই দেখবে তুমি। কড়ি খেলা এসব কী কঠিন জিনিশ, কিন্তু কবিতা। লিখতে লিখতে যদি কড়ি খেলবার জন্য উঠে আসতে হয়, উঠে আসতেই হয়, তাহলে বুঝতে হবে সাধারণ পৃথিবীর ভিতরে কবি কী অসাধারণ জীব, তার স্ত্রী কী গভীরভাবে সাধারণ।[২৭]

সিদ্ধেশ্বরবাবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাব্যচর্চার অবাধ সুযোগ ও সুখ্যাতি পেয়েছেন, তবুও নারীর প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। তার আকাঙ্ক্ষার স্ত্রী কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত – যেহেতু সিদ্ধেশ্বর কবি হিসেবে নিজেকে সাধারণের কাতারভুক্ত করতে চান না: 'একটি অসাধারণ স্ত্রী হয়তো আপনি পেতে পারতেন, আপনার মতো সেও লেখে –' অথবা 'একটি অসাধারণ স্ত্রী আপনি পেতে পারতেন। ... যে আপনাকে বোঝে, সহানুভূতি করে –' অথবা ' – এমন অনেক নারী আছে পুরুষের প্রতিভাকে যারা সাহায্য করে।... – সেরকম একজন স্ত্রী পেলে –' এসব আলাপচারিতার পুনরাবৃত্তিতে কবির জন্য আদর্শ স্ত্রীর একটা খসড়া প্রস্তুত হতে দেখা যায়। এরকম আদর্শ নারী জীবনানন্দের গল্পে কমই জন্মেছে। কিন্তু নারী যেখানে শিক্ষিত, আধুনিক, বুদ্ধিমতী এবং শিল্পচর্চার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সেইসব নারীও কি যথেষ্ট মর্যাদা নিয়ে, সুচারু ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিকশিত হয়েছে জীবনানন্দের গল্পে? 'বেশি বয়সের ভালবাসা' গল্পের আভা শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত ছিল, ব্যারিস্টার হতে চেয়েছিল, কবিতাচর্চা করে; সুহৃতের সঙ্গে ন্যাশনালিজম, রোমান্টিসিজম, রেস্টোরেশন ড্রামা, ড্রাইডেন স্পেন্সার থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ নেয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের কথা শুনে আভা যখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের লেখা কবিতার বই পায়ে মাড়িয়ে দেয়, তখনই তার বিলাতফেরত বড় ভাই সুহৃত নারী সম্পর্কে একটি সাধারণীকরণে উপনীত হয়:

> ইঞ্জিনিয়ার শাহেবের হ্যাটের বাছবিচার, টাই বাঁধার রকমারিও আভাকে আন্তরিকতা আগ্রহস্নিগ্ধ করে তুলেছে। কেমন কোমল পায়রার মতো এই মেয়েটি দুই মুহূর্ত আগেই কেমন রুক্ষ মুরগির মতো দেখাচ্ছিল – একেই। টাকাকড়ি সম্বন্ধে জীবনের প্র্যাকটিক্যাল দিক সম্পর্কে বোনের এই আগ্রহ সুহৃতকে আমোদ দিচ্ছিল, একটা কৌতুকে তার মন ভরে উঠল কী এদেশের কী ওদেশের সকলেই এরা – এই। শেষ পর্যন্ত সব মেয়েমানুষই এইরকম।[২৮]

'পূর্ণিমা' গল্পের চামেলি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার পাত্র পেয়ে তরল নারীতে পরিণত হয়, বিয়ের ভেতরে সার্থকতা খোঁজে। নারীর ব্যক্তিত্বের এরকম বিকাশ, নারীকে একমাত্র বিয়ের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ভেতরে তৎকালীন সমাজের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে। নারীরা সংসারের গণ্ডিতে সবসময় হিসেব-নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত। নারীর নিজের আয়ের উৎস না থাকায় স্বামীর আয়ের উৎসের ভিত্তিতে তার শ্রেণি নির্ধারিত হয়েছে। স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থানের উত্তান-পতন তার নিজের শ্রেণি উত্থান-পতনের সূচক। একারণেই নারীরা সবসময় অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারটি মাথায় রেখেছে, অর্থনৈতিক অবস্থান তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মুনাফালোভী ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন জীবনানন্দের আক্রমণস্থল, একইভাবে পুঁজির দোসর হিসেবে নারীও তাঁর ক্ষোভের জায়গা। চামেলির আত্মসমর্পণ সুরেশের মধ্যবিত্ত অহংকে আহত করে। লাবণ্য দাশের বড় বোনের স্বামী আইসিএস অফিসার ছিলেন, জীবনানন্দ দাশের গল্পে পুঁজি ও স্বচ্ছলতার প্রতীক হিসেবে আইসিএস বা ডাক্তার পাত্র এসে উপস্থিত হয়ে মধ্যবিত্তের টানাপড়েনকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। কবিতাতেও তিনি পুঁজির এই দাপট দেখেছিলেন:

নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব – অথবা যা নিলেমের নয়
সে সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে – সকলের জন্য নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচুলোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।[২৯]

গল্পের মতো কবিতাতেও নারীর অভিজ্ঞতা সুখকর নয়, তাই নানা কথা বলতে হয়, আলাদা করে বলতে হয় 'পুরুষ হৃদয়ে'র কথা, যা নারীহৃদয়ের চেয়ে আলাদা – 'আমার হৃদয় এক পুরুষ হরিণ'। একজন কবি যখন গল্পকার হয়ে ওঠেন তখন তাঁর গদ্যকাহিনিতেও সন্নিবেশিত হতে পারে শব্দের শৈল্পিক কারুকাজ, অথবা ব্যবহৃত শব্দের নান্দনিক মূল্য যদি নাও স্বীকার করা হয়, অন্তত এর প্রতীকী অর্থ-তাৎপর্যকে মেনে নিতে হয়। নারীর জন্য তিনি নির্বাচন করেন 'নারী', 'মেয়েমানুষ' বা 'মহিলা' শব্দাবলি, এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত বা শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ নয়, বরং সুচিন্তিত সমীকরণের ফল:

> যারা তাঁর জীবনে কাঙ্ক্ষিত, প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে যাদের গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তারা প্রেরণা দিতে পারে অথবা সময়ের ধূসরতায় অন্যমাত্রা পেয়েছে তাদের আখ্যা দিয়েছেন 'নারী'। কিন্তু যারা তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি, ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয়িত হয়ে যায়, ব্যর্থতায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে, নিজেকে নিজের গৌরবে উদ্দীপ্ত করতে পারে না, তারা মেয়েমানুষ। যেহেতু সেই মেয়েমানুষদের মন দেহকে অতিক্রম করতে পারে না, তাদের শরীরকে বলেছেন 'মাংস'।[৩০]

অন্যদিকে জীবনানন্দ পুরুষকেও 'পুরুষ' এবং 'পুরুষমানুষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর নিজের মানস প্রতিনিধি হিসেবে যারা একটি বিশেষ আদর্শকে লালন করে তারা 'পুরুষ' আর যাদের অবস্থান এই আদর্শের বিপরীতে তারা 'পুরুষমানুষ' এবং তারাও 'মাংস'। সৃজনশীল জীবনের মহত্ত্ব থেকে সুদূরে প্রথাগত জীবন ও জীবিকার ভেতরে সংকীর্ণ জাগতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বাস করা মানুষগুলো তাই শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টির যন্ত্রণার কাছে সস্তা হয়ে দাঁড়ায়: '– শস্তা নয়? এরা ভাতের ওপরে উঠতে পারল কি কেউ? ভাতের ক্লেদের ওপরে?'[৩১]

'পুরুষমানুষে'র মতো জীবনানন্দের গল্পে স্থান পেয়েছে 'মেয়েমানুষে'র ধারণা। 'শেষ পছন্দের সময়' গল্পের বয়ানকারী সুবোধ সাহিত্যিচর্চা করে, জগতের স্থূল ভোগ-বাসনার হিসেবের বাইরে তার অবস্থান। কলকাতার ওকালতি পেশা ফেলে বাড়ি ফিরে আসে গৃহের শান্তি ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে নিমগ্ন হয়ে সৃজনশীল চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে। বুকের ভেতর সে লালন করে এক রোমান্টিক মধ্যবিত্ত মন:

> [...] তেলাকুচোর নিবিড় পাতার ভিতর চৈত্রের সন্ধ্যায় মখমলের মতো নরম জোনাকি হবে সে এক, হৃদয়ে তার মাখনের ঘ্রাণ। সারাদিনের রোদপোড়ানির পর অন্ধকার রাতে পৃথিবী তার কাছে মস্তবড় একটা তরমুজের ঠাণ্ডা মাংসের মতো, রসের মতো।'[৩২]

কিন্তু বাড়িতে নানারকম অর্থনৈতিক টানাপড়েন, খাজনা দেবার টাকা নেই, ঘরের চাল 'ছ্যাঁদা' হয়ে গেছে, সে ছিদ্র দিয়ে নক্ষত্রের দিকে তাকাতে সুবোধের ভালো লাগলেও স্ত্রী মালতী ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সংসারের যাবতীয় হিসেব-নিকেশ সুবোধের কাছে পেশ করে মা রমাসুন্দরী এবং স্ত্রী মালতী। গল্প-উপন্যাসচর্চার ব্যাপারে আগ্রহ না থাকলেও স্কুলের ম্যানুয়াল লেখার ব্যাপারে দারুণ

আগ্রহ মালতীর, কারণ এর সাথে অর্থ-কড়ির নিশ্চিত যোগ রয়েছে। মালতী সম্পর্কে সুবোধের মূল্যায়ন:

> কোনো একটা জিনিস মালতীর জীবনকে আচ্ছন্ন করে নেই। না প্রেম, না গৃহস্থালি অবধি। কী নিয়ে তাহলে সে বেঁচে রয়েছে? সে কি বেঁচে থাকতে চায় না? কিংবা অত্যন্ত নিচুদরের জীবন তার? সুবোধ ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তার খুব কম। শুধু টাকার হিসাব নিয়ে, চায়ের পেয়ালার মাধুর্যে ও নিষ্ফলতা নিয়ে। খানিকটা মাংস নিয়ে, আবার সেই টাকার হিসেব নিয়ে।[৩৩]

নারীর মানস পরিবর্তনকে যুগের নিরিখে, সমাজবাস্তবতা বা শ্রেণিচরিত্রের আলোকে দেখেননি জীবনানন্দ, দেখেছেন মধ্যবিত্ত পুরুষের রোমান্টিক হৃদয়াবেগের তাড়নায়। ফলে বিশেষ গুণাবলি ও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা নিয়ে বিকশিত 'ভদ্রমহিলা'দেরকেও অনেক সময় ফেলে দিয়েছেন 'অপরে'র কাতারে। নারীর 'অপর'তা প্রতিষ্ঠায় এমন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন তিনি যাকে 'পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদী' (Androcentrism) দৃষ্টিকোণ বলে অভিযুক্ত করা যায়। এই মতবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো নারীকে 'deviance' হিসেবে শনাক্ত করা। এই বিন্যাস থেকে যদি জীবনানন্দের নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে অধিকাংশ সময়ে তারা পথভ্রষ্ট, বিচ্যুতি ও বিনষ্টিতে ভরা তাদের চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও আচরণ। সমালোচকের দৃষ্টিতেও নারীর এই রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে: 'জীবনানন্দ তাঁর পুরুষকেন্দ্রিক গল্পকাঠামোতে মফস্বলীয় মধ্যশ্রেণিবর্গের কেন্দ্রীয় চরিত্রাবলিকে স্মৃতিসচেতনতা, স্থিতিশীল আশ্রয় ও যৌথ মানবিকবোধে একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি দুর্বল ও সমর্পিত করে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু নববধূরা তাদের স্থূল সাংস্কৃতিক মনোবৃত্তি, অসহিষ্ণু অর্থ-দুর্বলতা ও আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি নিয়ে পরিবারকাঠামোতে হাস্যকর হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টি করে সামাজিক ও মানবিক সংকট।'[৩৪] 'নষ্ট প্রেমের কথা' গল্পে যৌথ-পরিবারের মূল্যবোধে নারীর আঘাতের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের বয়ানকারী মোহিত। সুরূপার সঙ্গে নতুন দাম্পত্য-সম্পর্কে জড়ানোর পর, স্ত্রী-সৃষ্ট জটিলতার বিষদ বিবরণে গল্পটি শুরু এবং শেষ হয়েছে। নায়ক মোহিতের ভেতর যথারীতি আদর্শ পুরুষের সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্যদিকে মোহিত দেখেছে, নতুন বউ সুরূপা প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করে, সংসারের সদস্যদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, এমনকি বয়োবৃদ্ধ ঠাকুরমাকেও না। স্বামী মোহিতের প্রতিও নতুন বউসুলভ কোন আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নেই, অর্থাৎ লজ্জাবনত নয়, বরং শুরু থেকেই তার নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা, আরাম-আয়েশের কথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে। তার চাওয়া-পাওয়া, মুখের কথা, এমনকি চোখের চাহনিতে পর্যন্ত বিনষ্টির ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বনলতা সেনের 'পাখির নীড়ে'র মাধুর্য বা 'হায় চিলে'র 'বেতের ফলের মতো ম্লান' ব্যথাতুর দৃষ্টির সঙ্গে গল্পের এ চাহনির দূরত্ব যোজন যোজন। 'সুখের শরীর', 'বাসর ও বিচ্ছেদ' গল্পগুলোতেও নারীরা প্রচলিত মূল্যবোধ ও সামাজিক আদর্শের মূলে আঘাত করেছে। নারীর বিনষ্টি, আদর্শচ্যুতি অথবা অর্থ ও পদমর্যাদার প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে 'ছায়ানট' এবং 'গ্রাম ও শহরের গল্প' শিরোনামের গল্প থেকে রেবা ও শচী নামক নারী দুটিকেও আলোচনা-সীমায় আনা যায়, যেহেতু নারী নিজে অর্থ-বিত্ত ও পদমর্যাদার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, কাজেই পুরুষের শ্রেণি-অবস্থানের দিকে তাকে কড়া নজর রাখতে হয়। 'ছায়ানট' গল্পে প্রধান চরিত্র কথক নিজে অসুস্থতার কারণে জীর্ণ দাপুটে পুঁজিবাদী সমাজের পরোক্ষ প্রভাবে হার্দিক সম্পর্কও হয়ে উঠেছে মলিন অর্থ ও বিত্তের প্রলোভনেই রেবা দ্বিচারিণী। পুরুষের সঙ্গে নারীর এই স্থূল বঞ্চনার কথা জীবনানন্দের গল্পে বারবার এসেছে। 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র শচীও মনকে অতিক্রম করে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে প্রাধান্য দেয়। ফলে

আদর্শবাদী নায়ক সোমেনের পরিবর্তে শচী তার জীবনসঙ্গী হিসেবে প্রকাশকেই নির্বাচন করে। কারণ প্রকাশ 'ফিকিরের সুড়ঙ্গ', অলিগলি চিনে চিনে জীবন ও ব্যবসাকে অভিন্ন করে দেখতে শিখেছে, সোমেনের প্রেম বা হৃদয়বৃত্তি শচীর কাছে মূল্যহীন, কবিতায় ধ্বনিত হতে দেখা যায় এরকমই অভিন্ন অনুযোগ: 'একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিল;/তবু মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।'[৩৫] জীবনানন্দের গল্পের নারীরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বরাবর প্রত্যাশা করেছে।

প্রজনন ও সন্তান পালনে নারী-পুরুষের ভূমিকা কী হওয়া উচিত – এটি জীবনানন্দের গল্পের দাম্পত্য-কাহিনিতে একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়, এই প্রশ্নটি অনেক সময় আধুনিকতা ও নারীজাগরণকে অতিক্রম করে নারীবাদী চেতনায় উন্নীত হয়। জীবনানন্দের নারীরা নারীবাদী চেতনার জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা জানা যায় না। সেসময় নারীর জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, এমনকি পরিবার নামক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটিও সবসময় নারীর জন্য মানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। 'বিন্দুবাসিনী' গল্পে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীন স্বর ধ্বনিত হয়েছে। বায়োস্কোপ দেখতে যাবার প্রত্যাশা থেকে সুষমা তার স্বামীকে জানাচ্ছে: 'দিনরাত এই ঘরের ভিতর থেকে থেকে আমি আর পারি না...এই গুটি গুটি ঘরদোর লোকজনের ভেতর সন্ধ্যা হলেই আমার প্রাণটা এমন মচকে যায় –উ।'[৩৬] ঘরের বাইরে যেতে, রিবন দিয়ে চুল বাঁধতে গিয়ে পদে পদে পারিবারিক রীতি-নীতির বেড়াজালে আটকে যায় সে, শাশুড়ি বিন্দুবাসিনী পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতিনিধি, এজন্য 'পরিবারের কর্তাদের থেকে বিন্দুবাসিনীর আলাদা কোনো মতামত নেই।'[৩৭] এ গল্পে সুষমা যথেষ্ট দ্রোহী, মুখের ভাষায় না বলতে পারলেও আচরণে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ভার্জিনিয়া উলফ, মেরি ওলস্টোনক্রাফটের মতো নারীর হাত ধরে নারীবাদ পেরিয়ে গেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, সে তরঙ্গের সঙ্গে বাঙালি নারীর প্রত্যক্ষ যোগ থাকার প্রমাণ না মেলায় জীবনানন্দের গল্পে প্রকাশিত নারীবাদী চেতনাকে তার স্বাধীন সত্তার সহজাত প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

'হাতের তাস' এবং 'বত্রিশ বছর পরে' গল্পের সুমিত্রা ও স্বর্ণের স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সচেতন। বেশিরভাগ গল্পের মতো 'হাতের তাস' গল্পের বয়ানও সম্পন্ন হয়েছে পুরুষ চরিত্র প্রমথের মাধ্যমে, সে বেকার হলেও যথারীতি শিল্পবোধসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। বিয়ের পরপরই প্রমথ এবং সুমিত্রার সন্তান টুক্কু জন্ম নেয়। সন্তান ধারণের ব্যাপারে সুমিত্রার মনোভাব প্রমথ তার মা হেমন্তশশীকে জানায়: '... বিয়ে হবার পরই সন্তান হল, মেয়েরা তা চায় না।'[৩৮] মধ্যযুগে যে নারীর স্বামীর নাম মুখে ধরার সাহস ছিল না, সন্তানকে 'দুধে-ভাতে' রাখাই ছিল যার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, সেই নারীর চেতনাগত রূপান্তর এমনভাবে ঘটেছে যে সুমিত্রার স্বামী প্রমথকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি 'বার্থ কন্ট্রোল ক্যাপে'র কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। 'বত্রিশ বছর পরে' গল্পটির কথক অভয়ের স্ত্রী স্বর্ণও বলেছে: 'বিয়ে করেই যদি মেয়ে হওয়া, ঘটা!'[৩৯] দেড় বছরের মেয়ে টুকুনকে পরিচর্যার দায়িত্ব, বিছানা গোছানো, মশারি ফেলা, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করার মতো সেবা ইত্যাদি দায়িত্ব অভয়ের কাঁধে সমর্পণ করেছে স্বর্ণ নির্দ্বিধায়। সংসারে সন্তান উৎপাদন ও তাকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে স্বর্ণ নিজের স্বাধীনতা এবং পিতার অংশগ্রহণ দাবি করেছে। স্বামীর আবেদনে সাড়া না দিয়ে স্বর্ণ ব্যক্ত করেছে তার যৌন-স্বাধীনতা। এসব কারণে অভয়ের কাছে স্ত্রীর ব্যক্তিসত্তাকে 'গুবরে পোকার মতো' মনে হয়েছে। এ গল্পে স্বর্ণ এক বিচ্যুত (deviant)

নারীর উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত। নারীর মানসবিবর্তনকে কালিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি বলেই এমন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটেছে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় নবজাগরণের কালে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে নারীর প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ,

> একটি ঔপনিবেশিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীই হচ্ছে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য আয়না, যার ভেতর দিয়েই সমাজের উপেক্ষিত কর্তাসত্তা ও অঞ্চলগুলোকে দেখে নেয়া যায়; দেখে নেয়া যায় সমাজ কেমন আছে, সেখানে 'অপর'-এর ওপর ক্ষমতাবানের নিপীড়ন কিংবা একের সঙ্গে অপরের বৈষম্য কতটা তীব্র।[৪০]

জীবনানন্দের গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকাঠামোয় স্থান পাওয়া নারীর নিজস্ব কোনো ভাষা নেই, পুরুষ চরিত্রের বয়ান থেকে উপলব্ধি করা যায় – সনাতন মূল্যবোধে অনাস্থা, যৌথ পরিবারের আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, সন্তান ধারণে অনীহা, সন্তান পালনে যৌথতার প্রত্যাশা, যৌন স্বাধীনতা, সামান্য পরিমাণে রাজনীতি-সম্পৃক্ততা এবং প্রবল আত্মসচেতনতা নিয়ে তারা বিকশিত। আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এসব নারীকে বিচার না করায় জীবনানন্দ দাশ নিজে যেমন তাদের 'অপর' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন তেমনি সাহিত্য-সমালোচকদের জন্য নারীর মূল্যায়নের একটি ভ্রান্ত সম্ভাবনাকে অবারিত করে দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল, স্বাধীন পেশা ও বৃত্তি, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশও ঘটেছিল, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসে নারীর সক্রিয়তার সব সংবাদ নথিভুক্ত হয়নি। হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলমান মধ্যবিত্তের ইতিহাসের অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে নারী মধ্যবিত্তের ইতিহাস। বাকি ইতিহাস অধীনতার ইতিহাস, যে মধ্যবিত্ত পুরুষ উপনিবেশের অধীন তারই পেশা ও মর্যাদাকে ধারণ করে 'তস্য' মধ্যবিত্ত হিসেবে নারী মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে নারী মধ্যবিত্তের বিলম্বিত উত্থান ও বিকাশের যে স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে তার উন্মোচন এখন কালের দাবি। সেই স্বতন্ত্র ইতিহাস বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের গল্পের নারী চরিত্রেরা পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৫), পৃ. ৫০

২ সোনিয়া নিশাত আমিন, উদ্ধৃত, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২) পৃ. ২৩

৩ আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৯) পৃ. ২৫৪

৪ সোনিয়া নিশাত আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৫ সিরাজ সালেকীন, *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প: জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬), পৃ. ৪৯

৬ দেবেশ রায়, 'সম্পাদকীয়', *জীবনানন্দ দাশ: বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা: ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৮৮), পৃ. ২৫৮

৭ প্রসাদ সেনগুপ্ত, *নবজাগরণে বঙ্গ ও বাঙালি*, (কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০২২), পৃ. ৫৪১

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ল্যাবরেটরি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৭২

৯ প্রসাদ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪১

১০ আজফার হোসেন, "রোকেয়া: উপনিবেশের ভেতরে ও বাইরে", *পাঠ: শব্দ ও নৈঃশব্দের রাজনীতি* (ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ২০২২), পৃ. ৮১

১১ জীবনানন্দ দাশ, *জীবনানন্দ-রচনাবলি*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬) পৃ. ১০০
[এরপর *জীবনানন্দ রচনাবলি* সংক্ষেপে *জীর* উদ্ধৃত হবে]

১২ তদেব, পৃ. ৬৬৪

১৩ তদেব

১৪ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ৩য় খণ্ড (ঐতিহ্য, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬) পৃ. ৪৯৭

১৫ তদেব

১৬ তদেব

১৭ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫১

১৮ তদেব, পৃ. ৪৫০

১৯ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৬

২০ সিরাজ সালেকীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২১ তদেব, পৃ. ৩১

২২ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬) পৃ. ৫৬২

২৩ তদেব

২৪ সিরাজ সালেকীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

২৫ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬), পৃ. ৪৫৮

২৬ অমিতানন্দ দাশ, "জীবনানন্দের নোটবই থেকে", *বিভাব, জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা*, সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ, সংখ্যা ৭৪, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪০৫

২৭ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ৫ম খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

২৮ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৪

২৯ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬) পৃ. ২৫

৩০ অতীন্দ্রিয় পাঠক, "জীবনানন্দের গল্পে প্রেম ও নারী", *অনুষ্টুপ, জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা*, ২য় খণ্ড, সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩৭

৩১ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২২

৩২ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৩৩ *তদেব*, পৃ. ৪৬৫

৩৪ বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মিজান রহমান [সংকলক ও সম্পাদক], *জীবনানন্দ দাশ: জীবন ও সাহিত্য*। (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৪৩০

৩৫ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৩৬ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬), পৃ. ৬২৫

৩৭ তদেব, পৃ. ৪৬৫

৩৮ জীবনানন্দ দাশ, *জীর*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৫

৩৯ তদেব, পৃ. ৬৮৮

৪০ আজফার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০